ভূমিকা

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রের (১৭৬০খ্রিষ্টাব্দ) সময় পর্যন্ত মধ্যযুগের বিস্তার। এই মধ্যযুগেই মঙ্গলকাব্য ধারার উৎপত্তি, আর তার আঁতুরঘর হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র ধারা মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির নেপথ্যে একটি ইতিহাস রয়েছে। তাই মঙ্গলকাব্যকে জানতে হলে তার ঐতিহাসিক পটভূমিকে জানা প্রয়োজন। মঙ্গলকাব্যগুলি মাটির সম্পদ। এই ইতিহাসের পেছনে রয়েছে বৃহত্তর সমাজ ও স্বয়ং কবি। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল এই মঙ্গলকাব্য। গ্রামবাংলার অশিক্ষিত, অর্ধশক্ষিত, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি ও বিকাশ। আগেই বলেছি মঙ্গলকাব্যগুলি মাটির সম্পদ; লোকায়ত দেব-দেবীর লীলামাহাত্ম্যক আখ্যানধর্মী কাহিনী কাব্যের পটভূমি। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব পল্লীবাংলায় হলেও, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনসমাজের বিশেষ যুগের সাহিত্য সাধনা হলেও তা শুধুমাত্র একটি জনসমাজের সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস থেকে উদ্ভব হয়নি। মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলাদেশের লৌকিক ও বাইরে থেকে আসা মিশ্র ধর্মমতের সাথে মিশে গিয়ে বিভিন্ন যুগে বা বিভিন্ন সময়ে যে সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়েছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তারই পরিচয় বহন করে চলেছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের তথা সমাজের ও যুগের আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি, ধর্ম বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে মঙ্গলকাব্য। কত শত গায়েনের মুখে মঙ্গল গান গীত হয়ে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছে; এবং তা কবি কল্পিত পুঁথিলেখার অনেক কাল আগে থেকেই। সমগ্র মধ্যযুগ ধরে মঙ্গলকাব্যের যে পরিব্যাপ্তি, তা আজও বর্তমান।

লৌকিক ও ধর্মাশ্রয়ী মঙ্গলকাব্যগুলি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অমূল্য দলিল। মঙ্গলকাব্যও সাধারণ মানুষের সুখ-দঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইস্তাহার। সমকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র ইতিহাস কাহিনীতে উঠে এসেছে। আদিযুগে জনজীবন ছিল ধর্মাচরণ নির্ভর; ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে বাঙালি জাতি নানা শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। এই বহুধা বিভক্ত জাতি গোষ্ঠী শক্তিশালী বিদেশী আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারল না। আমরা জানি অতিপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ বারবার বিদেশী ও বিধর্মী জাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু কোন বিদেশি শক্তিই বা বিধর্মী জাতিই বাঙালি সংস্কৃতিতে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করতে পারেনি। তবে তুর্কি আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে বাঙালি জাতি যথেষ্ট ভাবে

বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। বাঙালীর চিরপরিচিত অভ্যাস, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে প্রবল আঘাত হানে তুর্কি আক্রমণ।

১২০২ থেকে ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজি (কথিত) মাত্র সতেরো জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নবদ্বীপ জয় করেন। এর পর থেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা দেশের ইতিহাস মুসলমান শাসনের ইতিহাস। অবশেষে ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার সুলতান হলে কিছুটা সুখ-শান্তি ফিরে আসে। জনজীবন পরিস্থিতির সঙ্গে ধাতস্থ হতে শুরু করে। তুর্কি বিজয়ের ফলে ধর্ম ও সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, উচ্চ নিম্নবর্গের সংস্কৃতির মিলন ঘটে এবং তার ফলস্বরূপ বাঙালী জাতির স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে ড. ক্ষেত্র গুপ্তের কথায় বলা যায়, "দ্বিধা দীর্ণ বাঙালি ধর্মে ও আচরণে ঐক্যবদ্ধ হল। নির্জিত বাঙালি নূতন আদর্শে ও আশায় জাগরিত হল।"[১]

তুর্কি আক্রমণের দুশো বছরের ভয়াবহ সময়কাল অতিক্রম করে আমরা প্রবেশ করি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধারা - অনুবাদ সাহিত্য-বৈষ্ণব সাহিত্য-মঙ্গলকাব্য – এর ভিত্তিভূমিতে। মধ্যযুগের এই তিনটি ধারা বিশ্লেষণ করার পর দেখা যায়, মধ্যযুগের সাহিত্য সাধনার স্তরে রয়েছে মিলনের আকাঙ্ক্ষা। প্রাচীন যুগের রচনায় দেখা যায় বিভিন্ন অভিজাত-অনভিজাত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ না থাকলেও স্বাতন্ত্র্যজনিত বিরোধ ছিল। সেন যুগের কবি জয়দেব এই বিভেদ বন্ধনের গণ্ডী অতিক্রম করে বাঙালি জীবনের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। মধ্যযুগের সাহিত্য প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণ্য ধর্মচেতনার সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর জনজীবনের মিলনভূমি রচনা করেছিল। কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালী' মধ্যযুগে সাহিত্য ধারায় বৃহত্তর জনজীবনের মিলনভূমির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে পরিগণ্য। তিনি বাল্মীকি রামায়ণ কাহিনির লোকভাষায় অনুবাদ কর্ম সম্পাদনা করেছিলেন। ভারতীয় লোকভাষার হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরাণ 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর অনুবাদ করেন মালাধর বসু। স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্যকে বিসর্জন দিয়ে, লোকসান্নিধ্যের উদ্‌গ্রীবতায় - বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সূচনায় এই ব্রাহ্মণ কবিরাই জাতির মিলন আকাঙ্ক্ষা পূরণে রচনা কর্মে ব্রতী হন। বৈষ্ণবসাহিত্য পর্বে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস জীবনধর্মের সমন্বয় ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক পদ রচনা করে।

মধ্যযুগীয় সাহিত্য রচনায় অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্যও রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি যতই মিলনের ক্ষেত্রভূমি রচনার মধ্য দিয়েও সর্বস্তরে সেই মহৎ চেষ্টা স্থিতি লাভ করেনি। সর্বস্তরে এই বৃহৎ ও মহৎ প্রচেষ্টাকে প্রতিষ্ঠিত করতে,

ঐক্যবদ্ধ পরিণাম দান করার প্রেরণা নিয়েই আবির্ভূত হন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবই বাঙালি জাতির মিলনশক্তির সুষ্ঠু সুপরিকল্পিত পরিণতি লাভ করতে সাহায্য করে। একারনেই আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্যদেবের পূর্বে রচিত সাহিত্যকে বলি চৈতন্যপূর্ব বাংলা সাহিত্য এবং চৈতন্যদেবের জন্ম পরবর্তী সাহিত্য চৈতন্য পরবর্তী বাংলা সাহিত্য।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র ধারা মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যও আসলে কি? কেন এর নাম মঙ্গলকাব্য হল? বা এই কাব্য উদ্ভবের ইতিহাস কিরুপ? মঙ্গলকাব্যের সম্পূর্ণ রূপ কী তা বিশদে আলোচনা করে দেখতে হবে। অধ্যাপক-সমালোচক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'(দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন – "মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্য, চৈতন্য জীবনী, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ সম্বন্ধে আধুনিক কালের শিক্ষিত বাঙালির কিছু কিছু কৌতূহল, আকর্ষণ ও প্রীতি থাকিলেও একমাত্র মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রকে বাদ দিলে বর্তমানকালে বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও ছাত্র সম্প্রদায় ব্যতীত আর বড়ো কেহ মঙ্গলকাব্যও সম্পর্কে জিজ্ঞাসু নহেন। ১৮৭১ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'The Calcutta Review' পত্রে 'Bengali Literature' প্রবন্ধে এবং বেঙ্গল স্যোসাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের বক্তৃতায় ('A Popular Literature of Bengal' – 1870) মঙ্গলকাব্যও সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। অবশ্য 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি কবিকঙ্কণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার দুই বৎসর পরে প্রকাশিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' (১৮৭৩) মুকুন্দরাম, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, রামেশ্বর ও ঘনরামের উল্লেখ উল্লেখ থাকিলেও 'মঙ্গলকাব্য' নামক কোন বিশেষ সাহিত্য শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় অবহিত হইয়াছিলেন বলে মনে হয় না। রমেশচন্দ্র ১৮৭৭ সালে ইংরেজী ভাষায় 'Literature of Bengal' নামক বাংলা সাহিত্যের যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে অতি নিপুনতার সঙ্গে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের বিস্ময়কর কবি প্রতিভা ব্যাখ্যাত হইলেও মঙ্গলকাব্যও নামক কোনো স্বতন্ত্র পন্থার কাব্য সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র কোন মন্তব্য করেন নাই। ইহার প্রায় এক বৎসর পরে রাজনারায়ণ বসু 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮) নামক পুস্তিকাতেও মঙ্গলকাব্যের পৃথক শ্রেণী সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। তাই রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার ইতিহাসে কবিকঙ্কণের কাব্যকে 'চণ্ডীকাব্য' এবং কেতকাদাসের গ্রন্থকে 'মনসার ভাসান' বলিয়াছেন। অনুমান হয় রামগতি 'ভাসান' অর্থে মঙ্গলকাব্যই বুঝিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র

সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-র প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬) মঙ্গলকাব্যের বিশেষ শ্রেণী ও কাব্যশাখার স্বরূপ নির্ণয় করেন।"[২]

সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে স্বয়ং কবি ও বৃহত্তর সমাজ, অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল মঙ্গলকাব্য। এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে আর্য-অনার্য সম্প্রদায় সংঘাতে না গিয়ে লৌকিক দেব-দেবীকে আশ্রয় করে মিলন প্রয়াসে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে। এই অনার্য লৌকিক সমাজ থেকেই মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীদের উদ্ভব। পূজাপ্রচার, পূজাপদ্ধতি, লোক বিশ্বাস, সংস্কার, আআচার-আচরণ, মানসিকতা সবই অনার্য সমাজ থেকে উদ্ভূত। নিম্নবর্গের মানুষের কল্পিত দেবতার সঙ্গে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, মুসলিম প্রভৃতি নান ধারা ধারন করেছে মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় বলা যায় তৎকালীন সমাজে –"এমনি করিয়া উপদ্রুত অসহায় কৃষিসমাজ, নিম্নবর্ণ এবং স্ত্রীমণ্ডল ভয়ে-ভক্তিতে মনসার ভাসান গাহিয়াছে, চণ্ডীর মঙ্গলগান বাঁধিয়াছে, রঞ্জাবতী-লাউসেন-কানাড়া-কলিঙ্গার অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়াছে। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকায় রহিয়াছে একটি বিশাল গ্রামকেন্দ্রীক জল-জঙ্গল-পরিবেষ্টিত নদীমাতৃক বাংলা দেশ— যেখানে অস্ট্রিক নরগোষ্ঠীর লোকই প্রধান, যাহারা শিক্ষা-সভ্যতায় পুরোপুরি আর্যত্ব লাভ করিতে পারে নাই।"[৩]

মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। আমরা জানি খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ভারতচন্দ্রের সময় কাল পর্যন্ত মধ্যযুগের বিস্তার। তবে এরও পূর্বে মধ্যযুগে যে মঙ্গলকাব্যের অস্তিত্ব ছিল কিনা তা বলতে পারিনা; কারণ কোন লিখিত নিদর্শন আমরা পাইনি। তবে মনে হয় লৌকিক দেবদেবী ও তাদের পূজা, আচার, সংস্কৃতি, বন্দনা হয়তো সচল ছিল। পল্লীবাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্যে মৌখিক লোকায়ত সংস্কৃতি; ব্রতকথা, ধাঁধাঁ, পাঁচালি, লোককথা ও পুরাণ প্রভৃতি ঐতিহ্যের উৎসভূমি মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন – " আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্ম বিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।"[৪] আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যকে অর্থবহ করে তুলতে গিয়ে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ 'বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা'র ভূমিকায় বলেছেন – "মধ্যযুগের বাংলা কাব্য প্রধানতঃ তিনটি শাখায় বিভক্ত – অনুবাদ, আখ্যায়িকা ও গীতি। অনুবাদ শাখাই ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম – রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ ইহার উপজীব্য। অনুবাদ-শাখার পরই আখ্যায়িকা শাখার উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া অনুভূত হয়। বলাই বাহুল্য

যে, ধর্মীয় বিষয় বস্তুই সেই যুগের বাংলা বাংলা কাব্য-সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য ছিল। সংস্কৃত পৌরাণিক আখ্যায়িকা সমূহের অনুকরণে বাংলা-আখ্যায়িকা শাখার উৎপত্তি হইলেও, বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রকৃত অনুযায়ী ইহা অবিলম্বেই এক নতুন রূপ লাভ করিয়াছিল। সম্প্রদায় অনুসারেই এই আখ্যায়িকা শাখা পুনরায় দুইটি ভাগে বিভিক্ত ছিল – নাথ ও শাক্ত। দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র ধর্মবোধ অবলম্বন করিয়া এই দুইটি বিভাগ উৎপত্তি হইবার ফলে ইহারা অল্পদিনের মধ্যেই অঙ্গ ও ভাবগত পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া তুলিল – নাথ ধর্ম গুরুবাদী, ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার কামনা ও সাধনা গুরুর চরণে সমর্পন করাই ইহার লক্ষ্য; ঐহিক ভোগ ইহার লক্ষ্য নহে, -- এই দিক দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের সঙ্গে ইহার কতকটা ঐক্য আছে। শাক্ত ধর্মের লক্ষ্য যে কেবল ইহা হইতে স্বতন্ত্র তাহাই নহে, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐহিক ভোগই বাংলার লৌকিক শাক্ত ধর্মের কাম্য, অতএব প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবনই ইহার লক্ষ্য। এই বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ইহার আধ্যাত্মিক সাধনা গড়িয়া উঠিবার ফলে, বাংলার শাক্ত সাহিত্য ধর্মমুখীন হইয়াও সাহিত্য গুণের অধিকারী হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিল; কারণ সাহিত্যেরও উপজীব্য বাস্তব জীবন। সে যুগে ধর্মবিধান ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে শাসন করিত, সেই যুগের বাংলার লৌকিক শাক্তধর্ম শাশ্বত সাহিত্যের উপাদানকেই তাহার ধর্মবোধের ভিত্তি করিয়া লইয়া ধর্ম সাধনার ভিতর দিয়াই সাহিত্যরস-পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে। অতএব ধর্মবোধ ও সাহিত্য বোধের মধ্যে যে একটি বিরোধ আছে, তাহা এখানে দূর হইয়া গিয়া ধর্মের মধ্যে সাহিত্য এবং সাহিত্যের মধ্যেই ধর্ম স্থান পাইয়াছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শাক্তধারার অর্ন্তলোকে প্রবেশ না করিলে, এই বিষ্ময়কর ব্যাপারটি যে সম্ভব হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।।"[৫]

অতএব শক্তি দেবতার আখ্যায়িকামূলক গীতকে বিভিন্ন দেবতার মঙ্গলগীত বলে অভিহিত করা হইয়াছে; মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল ইত্যাদি। আবার পাঁচালীর সুরে সুরে গাওয়া হত বলে এই মঙ্গলগান গুলিকে এক একজন দেবতার পাঁচালী বলা হত; যেমন, মনসার পাঁচালী, মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী। তবে শুধুমাত্র শাক্ত-দেবতার আখ্যায়িকামূলক গীতিকেই যে পাঁচালী বলা হত তা নয়, পাঁচালীর সুরে গাওয়া অনুবাদ সাহিত্যকেও পাঁচালী বলা হত; যেমন – 'শ্রীরাম-পাঁচালী' (রামায়ণ), 'ভারত-পাঁচালী' (মহাভারত)। আবার মঙ্গল সংজ্ঞাটি ক্রমশ শাক্ত-দেবতার আখ্যায়িকামূলক রচনা থেকে বৈষ্ণব-চরিতাখ্যামূলক রচনাতেও প্রয়োগ হতে থাকে ; যেমন, 'চৈতন্যমঙ্গল', অদ্বৈতমঙ্গল' ইত্যাদি। এমনকি ভাগবতের অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'কেও মঙ্গল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে শাক্ত-দেবতাদের আখ্যায়িকামূলক রচনা বা মঙ্গল

গীত হওয়ার জন্য রচিত হত বলে তাদের সাধারণ নাম 'মঙ্গলগান'। ভূদেব চৌধুরী মঙ্গলকাব্যও সম্বন্ধে বলেছেন – "মঙ্গলসাহিত্য – তথা 'মঙ্গল' নামধেয় কাব্যগোষ্ঠীর অন্তর্গত রচনাবলী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক সম্পদ। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা একাধিক প্রভাবে পুষ্ট। এই বিচারে মঙ্গলকাব্যও গ্রন্থাবলীকে বাংলার মাটির ধন বলে অভিহিত করা যেতে পারে; আলোচ্য শ্রেণীর কাব্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ বাংলার লোকজীবনের জন্ম ও বিবর্তন ধারার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে।"[৬] আবার অন্যদিকে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেছেন – "বাংলা দেশে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত পৌরাণিক, লৌকিক এবং লৌকিক-পৌরাণিক সংমিশ্রিত দেব-দেবীর লীলামাহাত্ম; পূজা প্রচার ও ভক্তিকাহিনী অবলম্বনে যে ধরনের স্পম্প্রদায়গত, প্রচারধর্মী ও আখ্যান-মূলক কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাকে বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যও বলা হয়।"[৭]

মহারাজা অশোকের সময় হতে সমগ্র ভারতময় যে বৌদ্ধধর্মের একাধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল, এর কারণ অনুসন্ধান করতে বহুদূর অগ্রসর হতে হয় না। বাংলাদেশের অনতিদূরে অবস্থিত বিহার প্রদেশই বৌদ্ধধর্মের প্রথম উদ্ভবভূমি এবং মধ্যভারতের ব্রাহ্মণ্যসংস্কার বহুকাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের এই উদ্ভবভূমি বিহার প্রদেশ অতিক্রম করে বাংলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করতে পারেনি। অবশ্য স্বীকার্য যে, খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল; তারই ফলস্বরূপ আর্যভাষার সাথে সাথে আর্যসংস্কারও কিছু কিছু এই দেশে প্রবেশ লাভ করেছিল। এমনকি, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ উত্তরবঙ্গের মহাযান-হীনযান বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ইত্যাদির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মকেও বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী ধর্ম বলে উল্লেখ মনে করেছেন। তথাপি স্বীকার্য, পরবর্তী বৌদ্ধ পাল রাজাদের চারশত বৎসর রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম এদেশে তেমন বিস্তৃতি লাভ করতে পারেনি। যদিও পাল রাজাগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন

সেনরাজাদের সময় থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করতে আরম্ভ করলেও এতদিনের দেশীয় ধর্ম সংস্কৃতির যে উপাদানসমূহ এদেশের সমাজের মজ্জায় গিয়ে স্থান লাভ করেছিল, তা একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি। তারা নতুনকে যেভাবে গ্রহন করল, তা পুরাতনের নামান্তর মাত্র। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে মঙ্গলকাব্য ধারার উদ্ভব হয়; সেই মঙ্গল নামের উৎপত্তি হয়েছে কিভাবে তা দেখা যাক। প্রাচীন ভারতীয় রাগরাগিনীর মধ্যে অন্যতম রাগ ছিল মঙ্গল রাগ। কিন্তু মঙ্গল

রাগকে ষড়রাগ বা জনক রাগের অন্তর্গত বলা যায় না, তা রাগিনী বা উপরাগের পর্যায়ে পরে। আমরা আগেই জেনেছি যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল গেয় সাহিত্য; মঙ্গলকাব্যও এর ব্যতিক্রমী ছিল না। একারনণেই মনে হওয়া স্বাভাবিক , মঙ্গল রাগ বা মঙ্গলরাগের যা কিছু গাওয়া হত, সাধারণ ভাবে তাই মঙ্গল গান নামে অভিহিত। তবে মঙ্গলকাব্যের পুথিতে অন্যান্য রাগ-রাগিনীর ব্যবহার লক্ষ করা যেত। কিন্তু মনে হয় মঙ্গলরাগেই গাওয়া হত বলে এই শ্রেণির নাম মঙ্গলগান হয়েছে। প্রাচীন বাংলায় পাঁচালীর সুরে গাওয়া গানের নাম হয়েছে পাঁচালী। মঙ্গলরাগ ভোরবেলায় গাওয়া হত, কিন্তু মঙ্গলগান ভোর বেলায় গাওয়া হত না। মঙ্গলগানে পাঁচালীর সুর ব্যবহার হয়েছে ব্যাপক ভাবে; অতএব পাঁচালীও বলা হয়েছে মঙ্গলগানগুলিকে। সুতরাং পাঁচালীর উপর মঙ্গলরাগের প্রভাবের জন্যই তা মঙ্গল নামে পরিচিত হয়ে থাকে। মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি ও 'মঙ্গল' শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিদগ্ধ ব্যক্তিগণের ভিন্ন ভিন্ন মতামত উঠে এসেছে। মঙ্গলকাব্যের 'মঙ্গল' শব্দটির সঙ্গে শুভ ও কল্যাণের সাদৃশ্য আছে। মঙ্গল রাগ সম্পর্কিত মঙ্গল নামটি এসেছে দ্রাবিড় প্রভাব থেকে। দেবতার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন সম্পর্কিত বিষয়ই মঙ্গলকাব্যও নামে পরিচিত। আবার কোন কোন গান 'মঙ্গল' রাগে গাওয়া হত বলে সেখান থেকেও মঙ্গল বিধায়ক বিষয়টি আসা সম্ভব বলে মনে করা হয়।

মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তিতে বাংলায় আর্যীকরণের পূর্বে দ্রাবিড়, মুণ্ডা, কোল, ভিল ও অন্যান্য অনার্য অধিবাসীরা নিজেদের দেবদেবী কল্পনা, মহিমাজ্ঞাপক ব্রতকথা অ পাঁচালী রচনার চলমান ধারা বর্তমান ছিল। এমতাবস্থায় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সহজিয়া প্রভাব সেন রাজাদের ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ধর্মসংস্কার পরবর্তীকালে বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনার ফলে আর্য-অনার্য সংমিশ্রণ, ধর্মভাবনা সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে অনার্য শাখা থেকে উদ্ভূত দেবদেবীর থেকে পৌরাণিক দেবদেবীর মিলন সাধনই মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি। ড. অতুল সুর 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন' গ্রন্থে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, "আর্যসমাজের প্রধান দেবতাসমূহ ছিলেন পুরুষ দেবতা; আর আর্যেতর সমাজের প্রধান দেবতাসমূহ ছিলেন নারীদেবতা। আর্য দেবতাসমূহ যতই প্রাধান্য লাভ করতে লাগলেন, আর্যেতর এসকল নারীদেবতাসমূহ ততই পর্বতকন্দরে, ঝোপ জঙ্গলে বা গাছতলায় আশ্রয় লাভ করলেন। কিন্তু মধ্যযুগে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভিত্তি টলমল করে উঠল, তখন এসকল নারীদেবতা তাঁদের পর্বতকন্দর, ঝোপজঙ্গল ও গাছতলার আশ্রয় পরিহার করে ক্রমশ হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ধর্মসংস্কারের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলেন। এই অনুপ্রবেশকে সহজ করার জন্য তাঁদের পৌরাণিক মাতৃদেবতার সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপন্ন করা হল।"[৮] মঙ্গলকাব্যের দেহে পৌরাণিক , লৌকিক, আর্য-অনার্য,

জীবনধারণ, বৃত্তি, সংস্কার, কুসংস্কার সবই উঠে এসেছে। বিভিন্ন যুগে নানাবিধ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত ধর্মমতের যে মেলবন্ধন মঙ্গলকাব্যের পরিচয় বহন করে চলেছে। ভিন্ন ধর্মমত, আচার-সংস্কার, বিশ্বাস ; সম্প্রদায়গত বিশ্বস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছেন – "মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকায় রহিয়াছে একটি বিশাল গ্রামকেন্দ্রিক জল-জঙ্গল-পরিবেষ্ঠিত নদীমাতৃক বাংলাদেশ – যেখানে অষ্ট্রিক নরগোষ্ঠীর লোকই প্রধান, যাহারা শিক্ষা-সভ্যতায় পুরাপুরি আর্যত্ব লাভ করিতে পারে নাই।"[৯]

পল্লীবাংলায় যে যে লোকসমাজ ছিল তাদের প্রচলিত মৌখিক সাহিত্য বা লোকসাহিত্যের উপকরণ, বিশ্বাস, অলৌকিকতা, কুসংস্কার নিয়ে মঙ্গলকাব্যও রচিত। মঙ্গলকাব্যও যে মর্ত্যের ধূলিধূসরিত জীবনের সঙ্গে যুক্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, "মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বাংলার ছোট-ছোট, পল্লী-সাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাধিবার প্রয়াস।"[১০] শিবঠাকুর বাংলার নিজের দেবতা, কৃষিভিত্তিক বাংলার কৃষকের লৌকিক দেবতা, শিব গ্রাম্য চরিত্র। ধর্ম ও শিবপূজার সঙ্গে প্রস্তরখণ্ডের (শিবলিঙ্গ) সাদৃশ্য বর্তমান। ধর্মের শিলাখণ্ড সব জায়গায় আছে; তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বুট, জামা পরিহিত ধর্ম ঠাকুরের নিদর্শন পাই। আবার শিব ঠাকুরের পূজায় শিবলিঙ্গের সঙ্গে হর-পার্ব্বতীর মূর্তিই বেশী দেখা যায়। ধর্মের ক্ষেত্রে অনার্য ও নিম্ন হিন্দুদের লৌকিক জীবন ও বিশ্বাস অলৌকিকতা থেকে উঠে এসেছে। পরে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে পরিশীলিত রূপ ধারন করে মঙ্গলকাব্যের আকার ধারণ করেছে। বাংলার নিজস্ব উপাদানের সমন্বয়ে লৌকিক শাক্ত ধর্ম গঠিত হয়েছে, তাতে পুরাণ, হিন্দু বা বৌদ্ধের কোন সংযোগ সূত্র নেই। এপ্রসঙ্গে বলা যায়- "বাংলার লৌকিক শাক্ত ধর্ম এদেশের প্রাগৌতিহাসিক যুগের দানবপূজারই পরবর্তী সংস্করণ হইলেও কালক্রমে ইহা কতকগুলি নতুন বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল।"[১১] কালক্রমে এই দানবোচিত উগ্রতা বা অতিপ্রাকৃততা নির্মল ও হৃদয়বত্তার সঙ্গে মধ্যযুগের দেবদেবীরা মানবিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। দেবদেবীদের ক্রূরতা ক্রমে দেবী অন্নদায় পরিণত হয়েছে।

মধ্যযুগে আছে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়, শ্রেণিগত দ্বন্দ, তা সত্ত্বেও দেখা যায়—"বাংলার মধ্যযুগ লৌকিক জীবনের জাগরণ ও অভিব্যক্তিতে চঞ্চল ও মুখর। এই জাগরণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-সংস্কৃতির কিছুটা স্বীকার করে কিছুটা অস্বীকার করে আত্মপ্রকাশ করে। আর এও স্বীকার্য যে, এই স্বীকার-অস্বীকার একটা মূলগত সংঘাতের ফল, এই সংঘাত

ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিরুদ্ধে লৌকিক আদর্শের সংঘাত, ব্রাহ্মণ্য জীবন-দর্শনের সঙ্গে লৌকিক জীবন-দর্শনের সংঘাত।"[১২] বাংলার লোকধর্মের সূচনায় আছে পূর্ব থেকে প্রচলিত আদিম কৌম জনগোষ্ঠী ও তাদের বিশ্বাস, সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাব—"বস্তুত বাংলাদেশের যে জন ও সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রায় সমগ্র রূপায়ণই প্রধানত অ্যালপাইন ও আদি অষ্ট্রেলীয়, এই দুই জনের লোকেদের কীর্তি। পরবর্তীকালে আগত আর্য ভাষাভাষী আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ ও সংস্কৃতি তাহার উপরের স্তরের একটি ক্ষীণ প্রবাহ মাত্র, এবং এই প্রবাহ বাঙালীর জীবন সমাজের গভীর মূলে বিস্তৃত হইতে পারে নাই।"[১৩] গ্রাম্য দেবতা গ্রাম্য মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার থেকে সৃষ্টি। গ্রামদেবতা ও লৌকিক দেবতার অনেক নাম পাওয়া যায়; যেমন – লৌকিক শিব, কিরাত, কৃষিজীবী কৃষক পরে ব্রাহ্মণ যোগী তপস্বীরূপে বিবর্তিত হয়ে পৌরাণিক রূপ লাভ করেছে। ধর্ম, শিবঠাকুরের লিঙ্গপূজা, ধর্মের কূর্মমূর্তি, মনসার সর্পপূজা, শীতলা পূজা, বনবিবি পূজা, আঞ্চলিক বিশ্বাস, সংস্কার ও নিজেকে রক্ষা করার জন্য সর্বময় শক্তিকে নানা নামে, নানা পদ্ধতিতে উপাসনা করে থাকেন বহুশত বছর ধরে নির্দিষ্ট জনসমাজে লৌকিক দেবতার উদ্ভব, স্বপ্নাদেশ বা অন্যান্য নির্দেশের মধ্য দিয়ে জনসমাজে ছড়িয়ে পরে। স্বভাবত অলৌকিক শক্তির প্রতি দূর্বলতাবশতঃ মানুষ লৌকিক দেবতার চরণাশ্রয় করে বেঁচে থাকার বাইরে অন্য কিছু ভাবতে পারে না।

মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি পল্লীবাংলার লোকজীবন থেকে উদ্ভূত। তবে লোকসাহিত্যের উপকরণ অঙ্গীভুত থাকলেও তা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং মঙ্গলকাব্য একটি বিশেষ যুগের হয়েও তা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের আচার-আচরণে, ধর্মমতে, বিশ্বাসে এখনও বর্তমান। যেমন মনসার উৎসে অনার্য সর্পপুজা, সিজ পূজা ইত্যাদি, চণ্ডীদেবী প্রথমে ব্যাধের শিকারের দেবী ছিলেন, মেয়েলি ব্রতের দেবী, পশুদের ব্রতের দেবী ছিল। ধর্মঠাকুর প্রথমে প্রস্তরপুজা ও সূর্যদেবতা ছিল। বিভিন্ন রোগভীতি ও নিরাময়ের থেকে জন্ম নিয়েছে শীতলা, ওলাইচণ্ডী, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবদেবীরা। পরবর্তী সময়ে এরা অনার্য দেব পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মনসা শিবের কন্যা রূপে, চণ্ডী শিব পত্নী পার্বতী রূপে, ধর্ম শিব, সূর্যদেবতা, বিষ্ণু রূপে অভিহিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভবের পিছনে লোকসংস্কৃতিরও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কেননা মঙ্গলকাব্যের লৌকিক কাহিনী পল্লীবাংলার মানুষের গল্প বলেই মনে হয়। মঙ্গলকাব্যে আমরা দেখি নারীসমাজের সঙ্গে লৌকিক দেবতারা নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ।

ব্রতকথা, পাঁচালী-র ক্ষেত্রে আমরা নারী সমাজের ভূমিকাই মুখ্য। তাই মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে বারোমাস্যা, পতিনিন্দা, লৌকিক আচার-সংস্কৃতি প্রভৃতি লোক ঐতিহ্যগুলি মঙ্গলকাব্যে দেখা যায়। ব্রত-পাঁচালী, লৌকিক দেবতা সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যের ইতিহাসকার ড. সুকুমার সেনের উক্তি "গ্রাম দেবদেবী মাহাত্ম্যখ্যাপন উপলক্ষ্যে প্রাচীন কাহিনী ও রূপকথা একত্রিত হইয়া যে গেয় আখ্যায়িকা কাব্যগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকেই ব্রতগীত পাঞ্চালী বলিতেছি।"[১৪] বাংলার লোকধর্মের উদ্ভবের সূচনায় পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল আদিম কৌম জনগোষ্ঠী ও তাদের বিশ্বাস। সমাজ সংস্কৃতির প্রভাব থেকে বা গ্রামের নিম্নবর্গীয় জনসাধারণ অলৌকিক মায়ার ইন্দ্রজালে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছে, তাই জন্ম থেকে মৃত্যু সর্বত্রই দেবতার প্রভাব। জীবনের সুখ দুঃখ, জীবনের মঙ্গল কামনায় লোকদেবতার পূজার্চনা করা হয়ে থাকে। ব্রতগুলি লোক ঐতিহ্যজাত এবং তা বাস্তব জীবনের সঙ্গে জড়িত। যেমন – 'সুবচনীর ব্রত', 'তুষতুষলি ব্রত', 'কুলকুলটি ব্রত', 'ইতুব্রত' পরভৃতই ব্রতের কাহিনীর সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের যোগসূত্র রয়েছে। আবার মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভবের পিছনে ইতিহাসও রয়েছে; ধর্মমঙ্গলকাব্যে পাল বংশের ডোম সৈন্যদের বীরত্ব যেমন লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়, তেমনি চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যে যাওয়ার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌ-চলাচলের ইতিহাস জড়িত রয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যের সঙ্গে। কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব হয়নি। ইতিহাস প্রসঙ্গ লোকভাবনায় জড়িত হয়ে মঙ্গলকাব্য কাহিনিতে এসে পড়েছে বলেই মনে হয়।

সুতরাং মঙ্গলকাব্যের ধারায় মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন, অন্নদামঙ্গল কাব্য ধারার পরিচয় পেয়ে থাকি। এই ধারায় আদিকাব্য হিসাবে মনসামঙ্গল সর্বাধিক পরিচিত এবং মনসামঙ্গল কাব্যের প্রভাব পরবর্তী সময়ে লিখিত মঙ্গলকাব্যগুলিতেও পড়েছে। মঙ্গলকাব্যের দীর্ঘ কাহিনীকে বিভিন্ন পালায় বিভাজন করা হয়, আর মঙ্গলকাব্যও অনুযায়ী পালা বিভাগও আলাদা আলাদা হয়। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য আট দিনে গাওয়া হত এবং প্রত্যেক দিনে যে গীত হত তা দিবা ও রাত্রি পালায় কাহিনী ভাগ করা হত ষোল পালায়। চণ্ডীমঙ্গল বা অন্নদামঙ্গল কাব্য আটদিনে ষোল পালায় ভাগ করা থাকলেও ধর্মমঙ্গলকাব্য বারো দিনে চব্বিশ পালায় বিভক্ত। কারণ বারো সংখ্যাটি ধর্মপূজার ক্ষেত্রে পবিত্র সংখ্যা হিসেবে ধরা হত। আর মনসামঙ্গল কাব্য পালা এক পালা করে এক মাসের উপযোগী করে ৩০ পালায় বিভাজিত থাকত। সমগ্র মঙ্গলকাব্যের পালা গানের শেষের রাতের পালা ছিল 'জাগরণ' পালা। সারারাত জেগে গান গাওয়া হত বলে নাম হয়েছে 'জাগরণ' পালা। মঙ্গলকাব্যে জাগরণ পালার গুরুত্ব

বেশ তৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত মঙ্গলগানকে জাগরণ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু 'জাগরণ'-এর প্রকৃত অর্থ কী? খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে সর্বপ্রথম জাগরণ কথাটি ব্যবহার করেন – "পূজিয়াত ভগবতী করিল জাগরণ।"[১৫] কিন্তু 'চণ্ডীমঙ্গলে যে পালাবিভাগ রয়েছে তা দিবাপালা ও নিশাপালা। তাহলে জাগরণ কথার প্রকৃত অর্থ কী? এপ্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন – "কেবলমাত্র চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যেই নহে, প্রত্যেক মঙ্গল-কাব্যের যে পালা বিভাগ করা হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে একটি পালা জাগরণ পালা নামে উল্লেখিত হয়। ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন বিষয়ক চব্বিশটি পালার মধ্যে একটির নাম জাগরণ পালা। মনসামঙ্গলেরও একটি পালার নাম জাগরণ পালা। চণ্ডীমঙ্গল এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হইয়া সাত দিন ব্যাপিয়া গীত হইত ও অষ্টম দিবসে সমাপ্ত হইত বলিয়া বিষয় অনুসারে ইহার পালার নামকরণ না হইয়া বার অনুসারে (যথা – রবিবারের দিবাপালা, রবিবারের নিশাপালা ইত্যাদি) ইহার পালার নামকরণ হইত। চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে সোমবারের নিশাপালাটি দীর্ঘতম; মনে হয়, ইহা সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া গীত হইত এবং ইহাই চণ্ডীমঙ্গলের জাগরণ পালা। মঙ্গলগানের একটি বিশেষ পালাকে জাগরণ পালা বলা হইয়া থাকে বলিয়াই সমগ্রভাবে মঙ্গলগানকে জাগরণ গান বলা হয়।"[১৬] পালা বিভাজনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে শুধুমাত্র 'চণ্ডী-মঙ্গল' ও 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেরই সুনির্দিষ্ট পালা বিভাজন রীতি মেনে চলা হত।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় মধ্যযুগে উদ্ভব হওয়া মঙ্গলকাব্যেরও শ্রেণিবিভাজন আবশ্যক বলে মনে হয়। আমরা দেখতে পাই বৈষ্ণব সাহিত্য অবলম্বন করে 'চৈতন্যমঙ্গল', 'গোবিন্দমঙ্গল', 'কৃষ্ণমঙ্গল', 'অদ্বৈতমঙ্গল' ইত্যাদি রচিত হয়েছে; কিন্তু এগুলিকে মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না বা আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেও পড়ে না। কারণস্বরূপ বলা যায়, এর বিষয়বস্তু আলাদা – তা বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত চৈতন্যদেবের জীবনী, শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব লীলা মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত। এই গ্রন্থগুলিকে মঙ্গল নামে অভিহিত করা হলেও তার বিষয়বস্তু আলাদা এবং সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যের প্রভাবের জন্যই এরূপ নামকরণ হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস প্রণেতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে এপ্রসঙ্গে বলেছেন – "প্রসিদ্ধ চৈতন্য জীবনচরিতকার বৃন্দাবন দাস তাঁর অমর গ্রন্থ 'চৈতন্যভাগবত'কে সর্বপ্রথম 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে আখ্যাত করেছিলেন, এমন প্রবাদ প্রচলিত আছে। 'চৈতন্য-চরিতামৃত'কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থকে 'চৈতন্য-মঙ্গল' বলিয়াই সর্বদা উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের চৈতন্য-জীবনীর নামও 'চৈতন্য-মঙ্গল',

জয়ানন্দের রচিত চৈতন্য-জীবনীও 'চৈতন্য-মঙ্গল' নামেই প্রসিদ্ধ। ইহাদের বিষয়বস্তু হইতেই জানা যায় যে, এই শ্রেণীর সাহিত্য মধ্যযুগের পূর্বোল্লিখিত মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে; ইহা বৈষ্ণব জীবনচরিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইহা হইতে একটি বিষয় অনুমান করা যায় যে, সেই যুগে শাক্ত সম্প্রদায়ের মঙ্গলকাব্যের প্রচলন সমাজে এতো বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, শাক্ত বিদ্বেষী-বৈষ্ণবগণও তাঁহাদের বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক সাহিত্যবস্তুকে বাহ্যতঃ এই ভাবে শাক্ত প্রভাব চিহ্নিতও করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"[১৭]

মঙ্গলকাব্যের ধারায় প্রধান মঙ্গলকাব্যও হিসেবে আমরা মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল কাব্যকে পেয়েছি, তবে সর্বপ্রথম পাই মনসামঙ্গল কাব্যকে। তেমনি এমনও দেখা যায় মনসামঙ্গল ব্যতীত আর অন্য কোন মঙ্গলকাব্য বাংলাদেশ ব্যতীত দেশের অন্য কোথাও এতটা বিস্তৃতি লাভ করতে পারেনি; ধর্মমঙ্গল তো বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। মনসামঙ্গল কাব্যের দেবী মনসা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির দ্বারা পূজিত হুত, তবে একথাও বলা যায় যে, বাংলাদেশ একই জাতি অধ্যুষিত বা একই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রানিত ছিল না। আশুতোষ ভট্টাচার্যের কথায় বলা যায় "পশ্চিমবঙ্গের বাগ্‌দী-কেওট, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী-কোচ, পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র কিংবা মগ মূলতঃ যেমন অভিন্ন জাতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই, তেমনই ইহাদের প্রত্যেকের ধর্মীয় আদর্শও অভিন্ন ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আজ সমস্ত বাংলাদেশ – উত্তরবঙ্গের কোচ হইতে চট্টগ্রামের মগ পর্যন্ত – যে প্রায় একই লোকসংস্কৃতির অধিকারী, তাহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালীর সংস্কৃতির মধ্যে কতকগুলি একত্রীকারক (unifying) উপাদান (factor) ছিল ইহাদের ক্রমাগত প্রভাবের ফলে বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াও এই ঐক্যের সৃষ্টি হইয়াছে – বাঙ্গালীর জাতীয় পুরাণ মনসামঙ্গল তাহাদেরই অন্যতম।"[১৮]

কিন্তু এই ঐক্যবদ্ধ একদিনেই হয়নি, তা দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত থাকার দরুণ সুদীর্ঘ ও কার্যকরী হয়েছে মনসামঙ্গলকাব্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই সার্বিকভাবেই সাফল্য লাভ করেছে এবং তা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য হিসাবে রূপ লাভ করেছে। বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যে, সাংস্কৃতিক জীবনে নানাদিক স্পর্শ করে আছে মনসামঙ্গল, যা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যও পারেনি। এপ্রসঙ্গে সুকুমার সেনের উক্তি – "অ-পৌরানিক বলিতে যাহা প্রাচীনতর অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তী সংস্কৃত পুরাণে অপ্রাপ্ত। পরবর্তীকালে রচিত সংস্কৃত পুরাণে অল্পসল্প আছে তবে বেশি বিস্তৃতভাবে পাওয়া অথবা শুধুই পাওয়া যায় বাঙ্গালা সাহিত্যে পঞ্চম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে। অর্বাচীন

পুরাণে ও নব্য-ভারতীয় আর্যভাষায় লৌকিক সাহিত্যে পাওয়া গেলেও এসব দেব ভাবনার বীজ ঋগবেদে মেলে এমনকি কোন কোন দেবতা ও কাহিনীর বীজ আর আগে পাওয়া যায়। এইসব নবদেবতাকে লইয়া বাঙ্গালায় জনগণ মধ্যে যেসব লোকগাথার ব্যাপক প্রচলন হইয়াছিল তাহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে প্রমাণ পাই বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত (রচনাকাল আনুমানিক ১৫৩৭ – ৩৮ অব্দ)। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছিলেন, চৈতন্যর জন্মকালে জনগণ বিষহরির পূজায় মত্ত ছিল, মঙ্গলচণ্ডীর গান রাত্রি জাগিয়া শুনিত আর, "যোগীপাল ভোগীপাল ও মহীপালের গীত" শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হইত।"[১৯]

বৈদিক আর্যদের সঙ্গে সর্পের পরিচয় ছিল না প্রথমদিকে, যজুর্বেদের কাল থেকে তাদের মধ্যে সর্প ধারনা বিকশিত হয়। এ বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন "সর্প জাতীয় জীবের সঙ্গে বৈদিক আর্যরা ভারতবর্ষে এসেই প্রথম পরিচিত হন। অন্যপক্ষে, ভারতবর্ষে আর্য-পূর্বকাল থেকেই সর্প এবং সর্প-ভীতি সুপ্রচলিত ছিল। আর এই কারনেই পূজার মাধ্যমে সেই ভয়ঙ্কর জীবকে পরিতুষ্ট করবার রীতিও ছিল অতীব প্রাচীন। বৈদিক আর্যেরা ধীরে ধীরে সেই রীতিকে অনুসরণ করেছেন। এই সব দেখে মনে করা যেতে পারে, বাংলা দেশেও সর্পপূজার ধারা আর্য-পূর্ব যুগেই প্রতিপত্তি লাভ করেছিল।"[২০] বাংলার আদিম আদিবাসীদের মধ্যে আর্য-পূর্ব দ্রাবিড়রা ছিল প্রধান। দাক্ষ্যিণাত্যের নিম্নবর্গীয় দ্রাবিড়দের মধ্যে আজও সর্পপূজার প্রচলন আছে। আর বাংলা দেশের সঙ্গে এ বিষয়ে মিল দেখা যায়। ফলস্বরূপ বাংলার এই দ্রাবিড়দের থেকেই সর্পপূজার প্রচলন ঘটে। বর্তমানে সর্পপূজার তিনটি রীতির পরিচয় মেলে, যথা – নাগরাজ বাসুকি ও তার সরীসৃপ মূর্তির পূজা বিশেষভাবে উত্তর ও মধ্যভারতে প্রচলিত, দক্ষিণ ভারতে জীবন্ত সর্পপূজার আদর্শই প্রবল। বাংলাদেশে সর্পপূজার কেন্দ্রে আছে নারীরূপী সর্পদেবতা জাঙ্গুলী, পদ্মাবতী, মনসা ইত্যাদি নামে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় সর্পের প্রতীক পূজার রীতিও দেখা যায়। প্রতীক হিসাবে দেখা যায় মনসার ঘটেও অঙ্কিত সর্পফণা, ফণিমনসার গাছ; কিন্তু পূজণীয় দেবতা একজনই – মনসা। সর্পদেবতা রূপে এই মাতৃমূর্তির পরিকল্পনা বংলার সর্পপূজার বৈশিষ্ট্য। এই নারীদেবতার পূজা প্রধানত মাতৃতান্ত্রিক অনার্য সমাজের বৈশিষ্ট্য; আর্য সমাজ ছিল মূলত পিতৃতান্ত্রিক। আদিম অনার্য সমাজে এই মাতৃতান্ত্রিক অনার্য নারীদেবতার পরিচয় কী নামে তা জানা যায় না। তবে বৌদ্ধযুগের জাঙ্গুলী নামক দেবতা যে সর্পমাতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন তার পরিচয় আছে। সর্পদেবী মনসাকে ফণীময়ী, জাঙ্গুলী এবং বিষহরি

নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে আলোচ্য সর্পমাতৃকা 'বিষহরি' বা 'মনসা' নামেই অধিক পরিচিতি লাভ করেছে।

মনসামঙ্গলের আলোচনার পর আমরা জেনে নেব চণ্ডীমঙ্গলের স্বরূপ সম্বন্ধে। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের স্থান আলাদা মাত্রা বহন করেছে। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায় চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর অর্থাৎ চৈতন্য পরবর্তীকালে। ফলে ষোড়শ শতাব্দীর আগে রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই বলে অর্বাচীন কালের কাব্যগ্রন্থ থেকে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের প্রামাণিকতার মৌলিক পরিচয় পাওয়া অসম্ভব নয়। প্রাক্-চৈতন্যযুগে চণ্ডীমঙ্গলকাব্য লেখা হলেও তার নিদর্শন পাওয়া যায়নি; কিন্তু তার প্রমাণ মেলে বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্যভাগবত'-এ –

"ধর্ম কর্ম লোকে সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।"[২১]

আবার এও দেখা যায় –

"প্রভুরে দেখিয়া বলে নিমাই পণ্ডিত।
করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত।।
গায়েন সব ভালো মুঞি দেখিবারে চাউঁ।
সকল আনিয়া দিব যথা সেই পাউঁ।।"[২২]

বস্তুতপক্ষে বলা যায় যে, মঙ্গলচণ্ডীর উদ্ভবের ইতিহাস সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী মতের প্রচলন দেখা যায়। চণ্ডিপূজার বহুল প্রচলন ছিল, তবে চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে চণ্ডীমঙ্গলের পুথি পাওয়া যায়নি বলে তার স্বরূপ জানা যায় না। যাইহোক না কেন, চণ্ডীদেবতার উৎস সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাক। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্য চণ্ডীর উৎস সম্পর্কে বলেছেন – "চণ্ডী শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত, অর্থাৎ কোন অনার্য ভাষা হইতে পরবর্তীকালে সংস্কৃত শব্দকোষে স্থান লাভ করিয়াছে। চণ্ডী শব্দটি সম্ভবত অষ্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত। দ্রাবিড় ভাষাভাষী দৃশ্যত আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) জাতীয় ছোট নাগপুরের আদিবাসী ওরাওঁ নামক উপজাতীর মধ্যে 'চণ্ডী' নামে এক শক্তিদেবীর পরিচয় লাভ করা যায়।"[২৩]

রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের তুলনায় আমরা দ্বাদশ শতক পরবর্তী বিভিন্ন পুরাণ, যথা – 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ', 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ', 'হরিবংশ পুরাণ' – এ চণ্ডীদেবতার বিশদ বিবরণ পাই। এই সময়েই মঙ্গলকাব্যের লৌকিক-দেবদেবীরা ব্রাহ্মণ্য পুরাণের

সঙ্গে মিশে গিয়েছিল এবং এ থেকেই মনে হয় চণ্ডীদেবতা আদিতে অনার্য ছিলেন। কিন্তু সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মঙ্গলচণ্ডীর পরিকল্পনায় অনার্য পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেন। তাঁর মতে এই তান্ত্রিক এই মৌল-দেবপরিকল্পনার মধ্যে সংশয় রয়েছে। কারণ তন্ত্রকে বেদ-পুরাণের মত আর্য সংস্কৃতির প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা বলে মনে করা হয় না। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে উমা, চণ্ডিকা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মতো পৌরানিক দেবতার প্রভাবের কথা বলেছেন। অতএব ষোড়শ শতকে মুকুন্দ চক্রবর্তী ও দ্বিজ মাধবের লেখা 'চণ্ডীমঙ্গলে'র পুথি থেকেই তা বিচার করতে হবে। উক্ত কবিদ্বয় ছিলেন স্মার্ত পৌরাণিক সমাজের আদিবাসী এবং পুরাণ সম্বন্ধেও তাঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন বলে মনে হয়। আর এই কারণেই তাঁদের রচনায় চণ্ডীর বর্ণনায় আর্য-অনার্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। "বস্তুত মঙ্গলচুণ্ডীর cult পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা আদিমরূপ মুকুন্দরাম অথবা দ্বিজমাধবের কাব্যে অটুট থেকেছে – একথা কিছুতেই অনুমান করা চলে না। দ্বিজ মাধবের কাব্যে দেবীর পরিচয় প্রধানত দুর্গারূপেই। আসলে ঐ দুটি কাব্য মঙ্গলচণ্ডী cult-এর পরিণামী পরিচয় বহন করে; আর তাতে পুরাণ তন্ত্রাদির অজস্র প্রভাব রয়েছে। ফলে এই সব উপকরণের সাহায্যে মঙ্গলচণ্ডীর আদিম দেব স্বভাবের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় না।"[২৪] সুধীভূষণ ভট্টাচার্যও এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, "এই আদি মূর্তির মূলে যে-ঘোড়া তান্ত্রিক যে দেবীমূর্তি রহিয়াছেন, তিনি হয়ত অনার্য সমাজ হইতে গৃহীত।"[২৫]

সুধীভূষন ভট্টাচার্য অনার্য উৎস থেকে মঙ্গলচণ্ডীর উৎসের কথা অস্বীকার না করলেও তিনি ওরাওঁ দের দেবতা চাণ্ডীর সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর অভিন্ন পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করে নয়ে বলেছেন, "কালিকাপুরাণে কামাখ্যাক্ষেত্রের নিকটই মঙ্গলচণ্ডীর ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে একান্তই যদি অনার্য সমাজে মঙ্গলচণ্ডীর আদিপাঠের সন্ধান করিতে হয়, তাহা হইলে কিরাত মহাজাতির অর্থাৎ মোঙ্গলীয় অনার্যদের ধর্ম জগতেই তাহা করিতে হইবে, ওরাওঁ-মুণ্ডাদের সমাজে মঙ্গলচণ্ডীর আদি-পাঠ পাওয়া যাইবে বলে মনে করি না।"[২৬] অন্যদিকে সুকুমার সেন মনে করেন, "চণ্ডীমঙ্গলের অধিদেবতা দুর্গা অরণ্যানী বা বিন্ধ্যবাসিনী, তবে তিনি চণ্ডমুণ্ডমহিষাসুরবিনাশিনী নহেন; তিনি অভয়া। তাই প্রাচীন চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতারা তাঁদের কাব্যকে বেশীর ভাগ 'অভয়ামঙ্গল'ই বলিয়াছেন। বলা যায়, ইহাই এই পাঞ্চালী কাব্যের আসল নাম।"[২৭] অভয়া দেবী বনদেবী, তাহার আশ্রম ও বন সবার জন্যই আশ্রয়স্থল। বৈদিক সাহিত্যের শেষকালে এই বনদেবীকে বন্দনীয় রূপে পাওয়া যায়। ঋগবেদের দশম মন্ডলে এই অরণ্যদেবীর একটি স্তব আছে, সেখানে সেই অরণ্যদেবীই অরণ্যানী

অর্থাৎ অরণ্যের পূণ্য অধিকারিনী। এই অরণ্যদেবীই বহু শতাব্দী ধরে কবি কল্পনার রঙে নানা লোকভাবনার সঙ্গে জড়িত হয়ে বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গলের দেবী মঙ্গলচণ্ডী রূপে দেখা দিয়েছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পূর্ণ রূপ পাওয়ার আগেই লোক উৎস থেকে উত্থিত এই দেবী পুরাণে স্থান করে নেয়।

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যর পরেই আমরা পেয়েছি ধর্মমঙ্গল কাব্যকে। মঙ্গলকাব্যের একমাত্র পুরুষ দেবতা। ধর্মমঙ্গল কাব্য বা ধর্মঠাকুরের আদিরূপ কি ছিল? ধর্মঠাকুরের পূজা বাংলাদেশের সর্বত্র বিস্তৃত হয়নি, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্মঠাকুরের পূজা বাংলাদেশের একটি অতি প্রাচীন লৌকিক অনুষ্ঠান। তবে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে ধর্মঠাকুরের নির্দিষ্ট রূপ স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে আমরা ধর্মমঙ্গলের কোন পুথি পাইনি। তথাপি চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই ধর্মঠাকুর বিভিন্ন রূপ পরিকল্পিত হত; তার উদ্ভব তত্ত্ব জানা প্রয়োজন। বাংলাদেশে ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে cult বা উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। সামান্য পরিচয়েই মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য দেব-দেবীদের থেকে ধর্মঠাকুরের তফাৎ চোখে পড়ে। ধর্মমঙ্গল কাব্য বা ধর্মঠাকুর ছিলেন আঞ্চলিক দেবতা; মনসা বা চণ্ডীর মতো গোটা বাংলাদেশে তা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তেমনি মনসা ও চণ্ডীর যেমন নির্দিষ্ট মূর্তি রয়েছে, ধর্মঠাকুরের নির্দিষ্ট কোন মূর্তি নেই; তিনি নিরাকার, নিরঞ্জন। ষোড়শ শতকের পূর্বে আমরা ধর্মমঙ্গলকাব্যের কোন প্রামাণ্য দলিল পাইনি। তবে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ, উদ্ভব ইতিহাস এবং ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার মধ্য দিয়ে তা বিশ্লেষন করব।

তথ্যসূত্র :

১) গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (সংযোজনসহ) : আগস্ট ২০০৪, অষ্টাদশ সংস্করণ : আগস্ট ২০১২,পৃষ্ঠা – ৫৩।

২) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ : ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা – ৩৮।

৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ : ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা – ৪১।

৪) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-৭৩, একাদশ সংস্করণ : বইমেলা জানুয়ারি ২০০৬, দ্বাদশ সংস্করণ : ২০১২, পৃষ্ঠা – ৮-৯।

৫) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ : বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪, পুনর্মুদ্রণ : ২০১১, পৃষ্ঠা – ক-৩।

৬) চৌধুরী, শ্রীভূদেব : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, ভাদ্র ১৩৯১,পৃষ্ঠা – ১৭১।

৭) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ : ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা – ৩৮।

৮) সুর, অতুল : বাঙলা ও বাঙালির বিবির্তন, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম্ম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৫৯, অক্টোবর ১৯৫২, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মে ২০১৮, পৃষ্ঠা - ।

৯) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ : ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা – ৩৮ ।

১০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র, কামিনী প্রকাশালয়, ৫ নবীনচন্দ্র লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম কামিনী সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা – ৪৯০।

১১) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-৭৩, একাদশ সংস্করণ : বইমেলা জানুয়ারি ২০০৬, দ্বাদশ সংস্করণ : ২০১২, পৃষ্ঠা –৫৮।

১২) পোদ্দার, অরবিন্দ : মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : কার্ত্তিক, ১৩৫৯; অক্টোবর, ১৯৫২, ষষ্ঠ মুদ্রণ : মে, ২০১৮, পৃষ্ঠা - ৭১।

১৩) রায়, নীহাররঞ্জন : বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৬, সংযোজিত স্বাক্ষরতা সংস্করণ : ১৩৮৭, প্রথম দে'জ সংস্করণ : বৈশাখ ১৪০০, চতুর্থ সংস্করণ : অগ্রহায়ন ১৪১০, পৃষ্ঠা - ৩৩।

১৪) সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪০, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১ লা বৈশাখ, ১৩৯৮, অষ্টম মুদ্রণ, কার্ত্তিক ১৪১৪, পৃষ্ঠা - ১৫৭।

১৫) ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও রাণা, সুমঙ্গল (সম্পাদিত) : শ্রীকৃষ্ণবিজয় মালাধর বসু বিরচিত, রত্নাবলী, ৫৫ ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৪০৯, জানুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা – ১৫১।

১৬) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-৭৩, একাদশ সংস্করণ : বইমেলা জানুয়ারি ২০০৬, দ্বাদশ সংস্করণ : ২০১২, পৃষ্ঠা –৪৬।

১৭) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-৭৩, একাদশ সংস্করণ : বইমেলা জানুয়ারি ২০০৬, দ্বাদশ সংস্করণ : ২০১২, পৃষ্ঠা –৪৮।

১৮) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ : বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪, পুনর্মুদ্রণ : ২০১১, পৃষ্ঠা – ক-৪-ক-৫।

১৯) সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪০, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১ লা বৈশাখ, ১৩৯৮, অষ্টম মুদ্রণ, কার্ত্তিক ১৪১৪, পৃষ্ঠা - ১৫৫।

২০) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ : বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪, পুনর্মুদ্রণ : ২০১১, পৃষ্ঠা – ক-৪-ক-৫।

২১) চৌধুরী, শ্রীভূদেব : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, ভাদ্র ১৩৯১,পৃষ্ঠা – ১৭৯।

২২) সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০০০১, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮২, পঞ্চম মুদ্রণ : ২০১৫, পৃষ্ঠা - ৬।

২৩) সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০০০১, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮২, পঞ্চম মুদ্রণ : ২০১৫, পৃষ্ঠা - ১৮।

২৪) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-৭৩, একাদশ সংস্করণ : বইমেলা জানুয়ারি ২০০৬, দ্বাদশ সংস্করণ : ২০১২, পৃষ্ঠা – ৩৪৬-৩৪৭।

২৫) চৌধুরী, শ্রীভূদেব : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, ভাদ্র ১৩৯১,পৃষ্ঠা – ১৯৭।

২৬) তদেব, পৃষ্ঠা – ১৯৭।

২৭) তদেব, পৃষ্ঠা – ১৯৭।

২৮) সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪০, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১ লা বৈশাখ, ১৩৯৮, অষ্টম মুদ্রণ, কার্ত্তিক ১৪১৪, পৃষ্ঠা - ৪১২।